সাতদিন

৩০ জানুয়ারি : হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে প্রস্তুত ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

৩১ জানুয়ারি : কমিশনের বৈঠক ছাড়াই ভোটার তালিকা তৈরির কাজ আরও তিন সপ্তাহ বাড়ানোর ঘোষণা দিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

গোলাম রাব্বানীসহ বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির ৯ নেতার জামিনে চাঁপাইনবাগঞ্জের কানসাটে জনতার আনন্দ মিছিল।

১ ফেব্রুয়ারি : বাংলা ভাইসহ রাজশাহী এলাকায় জঙ্গি তৎপরতায় মদদ দেওয়ার অভিযোগে পুলিশের এসপি মাসুদ মিয়া ও খায়রুল ইসলামকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

রাজারবাগ পীর ও তার অনুসারীদের সুনামগঞ্জ শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করাকে কেন্দ্র করে রাতভর সংঘর্ষে ৩০ পুলিশসহ শতাধিক লোক আহত হয়েছে।

২ ফেব্রুয়ারি : ১৪ দলের লংমার্চ শুরু উপলক্ষে সারা দেশে শুরু হয়েছে পুলিশের গণগ্রেপ্তার।

মোহাম্মদপুরে আটকেপড়া পাকিস্তানি ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি আহত। ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩ ফেব্রুয়ারি : লংমার্চকে মোকাবেলা করতে ঢাকায় ২৪ ঘন্টায় ১২০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশে আরও ২ হাজার গ্রেপ্তার।

বাড়ির পেছনের ম্যানহোল থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের লাশ উদ্ধার। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি।

৪ ফেব্রুয়ারি : লংমার্চের তৃতীয় দিনে ঢাকাতেই ৮ হাজার গ্রেপ্তার করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে গ্যান্ট্রি ক্রেনের ব্যবহার সংক্রান্ত জটিলতার সমাধান হয়েছে।

৫ ফেব্রুয়ারি : ব্যাপক বাধা ও ধরপাকড়ের মুখে পল্টনে ১৪ দলের লংমার্চ শেষ হলো। রাজধানীতে তেমন জানজট পরিলক্ষিত হয়নি।

অযৌক্তিক বাধাদান হরতাল এবং আ.লীগের সংসদে ফেরা

বদরুল আলম নাবিল

১৬ মাস পর সংসদে ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। সরকারি দল, দেশের সাধারণ মানুষ এমনকি আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাও এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ কেন হঠাৎ তাদের কথিত কঠোর অবস্থান থেকে সরে এল। শেখ হাসিনা ও আব্দুল জলিলসহ আওয়ামী লীগ নেতারা এতো দিন বলে আসছিলেন, তাদের দাবি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে না নেয়া পর্যন্ত তারা সংসদে যাবেন না; এমনকি সংসদের বাইরেও সরকারের সঙ্গে কোনো আলোচনায় বসবেন না। তাদের দাবি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি সংস্কার, নির্বাচন কমিশন শক্তিশালীকরণ, প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ নবনিযুক্ত দুই কমিশনারের পদত্যাগ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণসহ ২৩ দফা। এগুলোর মধ্যে তাদের কোনো দাবিই পূরণ হয়নি। সরকার মেনে নেয়ার কথাও বলেনি। তবে কেন আওয়ামী লীগ সংসদে ফিরছে?

আওয়ামী লীগ বলছে, তত্ত্বধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার বিল উত্থাপনের জন্য তারা সংসদে যাবে। সরকার হুবহু তাদের দাবি

লংমার্চ শেষে মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা

অনুযায়ী আইন পাস না করলে প্রয়োজনে তারা একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করবেন। তবে বিরোধীরা আকারে-ইঙ্গিতে বলছেন, চলতি অধিবেশনে যোগ না দিলে আওয়ামী লীগ সাংসদদের সদস্যপদ চলে যাবে বলেই তারা সংসদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যে দাবি নিয়ে আওয়ামী লীগ সংসদে যাবে বলে ঘোষণা দিল, একই জনসভায় সেই দাবিতেই ১৫ ফেব্রুয়ারি হরতাল ডাকায় (সংসদে যাওয়ার আগেই) এই মনোভাবের যৌক্তিকতা জোরালো হয়েছে। এই হরতালের যৌক্তিকতা কী জনগণ বুঝতে পারছে না। সংসদে বিল

উত্থাপনের পর প্রত্যখ্যাত হলে, তখনই হরতাল বা তাদের ভাষায় আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়ার যৌক্তিকতা দাঁড় করানো যেত।

দেশের মানুষ চায় সরকার ও বিরোধীদের সব টানাপড়েনের সমাধান সংসদেই হোক, রাজপথে নয়। গণতন্ত্রের দাবিও তাই। তা না হলে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সংসদ নির্বাচন ও সংসদ পরিচালনার অর্থ কী? আওয়ামী লীগ বলছে, সংসদে বিরোধী দলকে কথা বলতে দেয়া হয় না বলেই তারা যাচ্ছেন না। সরকারের দয়িত্ব বিরোধীদের কথা বলার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। তা না হলে সংসদ ও গণতন্ত্র কার্যকর হবে কীভাবে। অন্যদিকে কথা বলতে দেয় না- এরকম যুক্তিতে সংসদে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। কারণ দেশের মানুষ তাদের নির্বাচিত করে সংসদে পাঠিয়েছে জনগণের পক্ষে কথা বলতে। সরকার কথা বলতে না দিলে প্রতিবাদ করবে, ওয়াকআউট করবে, আবার সংসদে ফিরে যাবে। আর বর্তমানে মিডিয়া যেহেতু আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি পেশাদার, ফলে মানুষ জেনে যাবে তাদের কথা বলতে দিচ্ছে না। তাতে সরকারের বিপক্ষে জনমত তৈরি হবে। বিরোধীদের উচিত এই সুযোগটি নেয়া।

সরকারের মন্ত্রীরা বলে বেড়ান, তারা বিরোধীদের সংসদে কথা বলতে ও রাজনৈতি কর্মসূচিতে বাধা দেন না। গত ২২ নভেম্বর ও ৫ ফেব্রুয়ারি ১৪ দলের মহাসমাবেশ উপলক্ষে সরকারের কর্মকাণ্ড কিন্তু তাদের সেই দাবির সমর্থন দেয় না। এই কর্মসূচি ঠেকাতে গণগ্রেপ্তার, পথে পথে বাধাদান, পরিবহন ধর্মঘটসহ সব চেষ্টাই করেছে সরকার। কিন্তু কেন সরকার এরকম কর্মসূচিতে বাধা দিচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। তবে কি সরকার ভয় পেয়ে এ রকম আচরণ করছে? সরকার কি নিজেদের এতই দুর্বল ভাবে যে এরকম এক-দুটি মহাসমাবেশ সফল হলে তারা বেকায়দায় পড়ে যাবে? সরকারে উচিত সহনশীল আচরণ করা। বিরোধীদের কাছ থেকেও মানুষ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি প্রত্যাশা করে। কারণ হরতালের মতো নেতিবাচক কর্মসূচিতে সরকারের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। নিদারুণ সমস্যায় পড়ে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি।

একটি গল্প শুনেছিলাম এরকম- ১০ রাজনীতিবিদ একটি হেলিকপ্টারে করে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাচ্ছিলেন। পথে একটি বনের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় হেলিকপ্টার ক্রাশ করে। শহরটি রাজধানী থেকে দূরে হওয়ায় উদ্ধারকারী দল সেখানে পৌঁছাতে দেরি হয়। উদ্ধারকারী দল স্পটে পৌঁছে দেখলো স্থানীয় কৃষকরা সবাইকে কবর দিয়ে দিয়েছে। উদ্ধারকারী দলের একজন কৃষকদের জজ্ঞেস করলো, সবাই কি মারা গিয়েছিল? কেউ নড়াচড়াও করেনি? কৃষকরা বললো, হ্যাঁ কবর দেয়ার সময় কয়েকজন বলছিল তারা বেঁচে আছে, মরেনি। কিন্তু আমরা তাদের কথা বিশ্বাস করিনি। কারণ রাজনীতিবিদরা এরকম অসত্য বেশি বলে।

রাজনীতিবিদদের ইমেজ কিন্তু সত্যিই এরকম। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হওয়া সত্যেও তাদের কথার গুরুত্ব নিজেরাই দেন না। আজ একটি বলেন তো কাল তার বিপরীত বলেন। কখনো কখনো জেনেশুনে অসত্য বলেন। আবার কখনো যা বলেন তা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না। এই অবস্থা আর কতো কাল চলবে? তাদেরকেই ফিরিয়ে আনতে হবে নিজেদের হারনো বিশ্বাস, যোগ্যতা, কথা ও কাজের মিল প্রতিষ্ঠা করে।

পারভেজ চৌধুরী চিকিৎসা তহবিল
আরো যারা অংশ নিয়েছেন

১. মোঃ তারিক আব্দুল্লাহ	১০ ডলার
২. রুহানা হাফিজ	৫০ ডলার
৩. আহসানুল আরেফীন	৫০ ডলার
৪. শামসুদ্দিন চৌধুরী	১০ ডলার
৫. শাহরিয়ার মাহমুদ	১০ ডলার
৬. ফজলে বাকি	২০ ডলার
৭. নাসিমুন নোমান	২০ ডলার
৮. বাংলাদেশী আমেরিকান জাতীয়তাবাদী ছাত্র ফোরাম ইনক-এর পক্ষ থেকে মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	২৫০০০ টাকা
৯. জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু	১০০০ টাকা

র‍্যাবের রাবিশ কান্ড

কথায় আছে কয়লা ধুলে ময়লা যায় না। বিষয়টি পুলিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুলিশকে জমকালো পোশাকে যতই নতুনভাবে উপস্থাপন করা হোক না কেন, মূল চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না।

সৎ চরিত্রের দাবিদার হিসেবে পুলিশ বিভাগে যারা চিহ্নিত ছিল তাদের দিয়েই মূলত র‍্যাব গঠিত হয়েছিল। একইভাবে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর সৎ ও চরিত্রবান অফিসার এবং সিপাহিদের নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে এরা সবাই কম-বেশি সমালোচনার শিকার হয়েছে। বাগাড়ম্বর করে র‍্যাব সম্পর্কে যতই প্রচার করা হোক না কেন, মূল জায়গায় যে ত্রুটি রয়ে গেছে তারই প্রমাণ সাভারের ১১ লাখ টাকা লুটের ঘটনা। প্রতারক ভন্ড পীর সাহেব আলীর যোগসাজশে র‍্যাব সদস্যরা লুটের ঘটনার জন্ম দেয়।

গত শনিবার রাতে সাভারের পৌর এলাকার আড়পাড়ায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল খালেকের বাসায় ভন্ড পীর ও র‍্যাব সদস্যরা জঙ্গি ধরার নামে ১১ লাখ টাকা লুট করে চলে যায়।

পরবর্তীতে চেয়ারম্যান আব্দুল খালেকের উপস্থিত বুদ্ধিতে অর্থ উদ্ধার হয় এবং র‍্যাব হেড কোয়ার্টারের গোয়েন্দা বিভাগের ডিএডি মতিউর রহমান কনস্টেবল মাসুদ ও কনস্টেবল রফিক ধরা পড়ে।

আব্দুল খালেকের দ্বিতীয় স্ত্রী ফেন্সি ভন্ডপীর সাহেব আলীর প্রতারণা থেকে রক্ষা পাবার জন্য র‍্যাব ডেকে আনে। র‍্যাব সদস্যরা উল্টো ১১ লাখ টাকা লুট করে। তারা যে পুলিশ থেকে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় এলেও চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। উন্নত বিশ্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা জনগণের বন্ধু।

আটক র‍্যাব সদস্য মতিউর রহমান ও রফিকুল ইসলাম

আমাদের দেশে পুলিশ বা র‍্যাব সদস্যরা লুটেরা হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। জনগণের বন্ধু হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে না। সময় ও পরিবেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে যদি দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিতর্কিত হয়ে পড়ে, তবে তার দায়দায়িত্ব পড়ে সমগ্র জাতির ওপর। পুলিশ বা র‍্যাবের নিজস্ব প্রয়োজনেই বিতর্কিত পন্থা ছেড়ে জনগণের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত।

খোন্দকার তাজউদ্দিন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকগণ নিজেদের নিরাপদ ভাবছেন না

সাজেদুর রহমান

মন-মননে সমৃদ্ধ মানুষ যারা তারাই তো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক। একটি জাতিকে তারা আলো দেখান। আলোকিত সে পথ ধরে জাতি এগিয়ে চলে সমৃদ্ধির পথে। অথচ তারাই একের পর এক নৃশংসভাবে খুন হচ্ছেন। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিভাগের শিক্ষক ড. তাহের সেই কলঙ্কজনক তালিকার সর্বশেষ সংযোজন।

ড. এস তাহের আহমেদ

ড. এস তাহের আহমেদের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পুলিশ এখনও মুখ খুলছে না। দু'জন সিকিউরিটি গার্ডকে গ্রেপ্তার করেছে খুনের ব্যাপারে জড়িত থাকার সন্দেহে। রাজশাহীবাসীর ধারণা ড. তাহের হত্যাকান্ডটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে যেসব হত্যাকান্ড ঘটেছে সেসবেরই ধারাবাহিকতার অংশ। দেশের মানুষের জানা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরে জামায়াত-শিবিরের শক্ত ঘাঁটিরূপে পরিচিত। এই মৌলবাদী চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষক, নেতৃস্থানীয় ছাত্রনেতা, কর্মী ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত কর্মীদের হত্যা বা উৎখাতের চেষ্টায় তৎপর। মাত্র ১৩ মাস আগে তারাই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসকে হত্যা করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে। অধ্যাপক ইউনুস হত্যার তদন্ত ১৩ মাসেও শেষ হয়নি। তদন্ত কাজ এতদিন ধরে মাঝপথে থমকে রয়েছে। এখনও পুলিশ গ্রেপ্তারকৃত এক দুর্ধর্ষ শিবির ক্যাডারের বিরুদ্ধে মামলার চার্জ গঠন করতে পারেনি।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এ দীর্ঘ সময়ে অধ্যাপক ইউনুস হত্যাকান্ডের চার্জ গঠন অসমাপ্তের পেছনে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। এ সবের লক্ষ্য উক্ত হত্যার আসল কারণটি চাপা দিয়ে হত্যাকারীদের রক্ষা করা। কাজেই প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে ড. তাহেরের হত্যাকান্ডটি নিয়েও কী অনুরূপ কৌশলের আশ্রয় নেয়া হবে?

ড. তাহের শিক্ষকদের সাদা দলের সদস্য ছিলেন। এই সাদা দলটি বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত দল। কিছুদিন আগে ড. তাহের এই দল থেকে পদত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, ড. তাহের বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া পরিষদের সদস্য ছিলেন। কিছুদিন আগে দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়। এতে তিনি সাদা দল ও জিয়া পরিষদ দুটো থেকেই পদত্যাগ করেন। এতে পরিষদের সদস্যরা তার ওপর রুষ্ট হয়ে ওঠেন। এই সুযোগটাই নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি গেড়ে থাকা উগ্র মৌলবাদী খুনিচক্র। তিনি আরো জানান, এখানকার কোন শিক্ষকই নিজেদের নিরাপদ ভাবছেন না। বিশেষ করে প্রগতিশীল গ্রুপের শিক্ষকগণ সবসময়ই আতঙ্কে থাকেন।

অধ্যাপক তাহেরের মৃত্যুর খবরে দাগ একটু পড়েছে বটে। গত বছর প্রফেসর ইউনুসকে যখন হত্যা করা হয়েছে, তখন তোলপাড় হয়েছিল, বিক্ষোভ হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কি সেই ঘটনা ভুলে যেতে বসেনি? সেই হত্যার কোনো প্রতিকার হয়নি। আবার আরেকজন শিক্ষক মারা গেলেন। এই শিক্ষকের অবস্থাও যে পূর্বসূরিদের মতো হবে বলা যায় নিঃসন্দেহে। আবার হয়তো ছয় মাস কিংবা এক বছর পর এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটবে। তখন তা আমাদের মনে আর কোনো রেখাপাত করবে না। মনে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের হত্যাকান্ড তো খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

পাত্র/পাত্রীর

পাত্রী চাই

শামসুর রাহমানকে সম্মাননা জ্ঞাপন

বাংলাদেশের বরেণ্য কবি, বাংলা কবিতার রাজপুত্র শামসুর রাহমানকে সশ্রদ্ধ সম্মাননা জানালো নতুন ধারার দৈনিক আমাদের সময়। গত ৩১ জানুয়ারি আমাদের সময় হলরুমে আয়োজিত প্রাণবন্ত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান কবি ও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব কবি আল মাহমুদ।

কবিতাপ্রেমী শত শত মানুষের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. এম এ হান্নান ফিরোজ।

তাকে সম্মাননা জানানোর পর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কবি বলেন, আজ আমার কিছু বলার নেই। বিশেষ অতিথি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, শামসুর রাহমান বাংলা ভাষার জীবিত কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রজ্ঞা লাবণীর উপস্থাপনায় এ অনুষ্ঠানে কবির লেখা দুটি কবিতা 'দুঃস্বপ্ন একদিন' এবং 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯' আবৃত্তি করেন কাজী আরিফ। আসাদুজ্জামান নূর আবৃত্তি করেন 'এক ধরনের অহঙ্কার'। এছাড়াও কবির লেখা দুটি কবিতা 'কখনও আমার মাকে' ও 'স্বাধীনতা তুমি' নিয়ে সুরারোপিত গান পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী অজিত রায় ও রফিকুল আলম।

কবির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননাপত্রটি তুলে দেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তা পাঠ করে শোনান কবি আসাদ চৌধুরী। পরে কবির হাতে ১ লাখ ১ টাকার চেক তুলে দেন কবি আল মাহমুদ।

চা-চক্রের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে বর্ণাঢ্য এ কবিপ্রেমীদের মিলন মেলা।